SEMESTER- 4
SUBJECT: PHYSICAL EDUCATION
PAPER: DSC-1DT: HEALTH EDUCATION, PHYSICAL FITNESS AND WELLNESS
Unit-II : Health Problems In India-Prevention And Control
A) Communicable Disease- Malaria, Dengue , Chicken Pox And Diarrhea।
B) Non-Communicable Diseases – Obesity, Diabetes, Asthma।
C) Nutrition- Nutrition Requirements For Daily Life, Balance Diet And Deficiency Of Protein, Vitamin And Minerals।
D) Postural Deformities- Cause And Corrective Exercises Of Kyphosis, Lordosis, Scoliosis, Knock Knee, Flat Foot And Bow Leg।

DR. NASIM AHMED
Assistant Professor & HOD
Department Of Physical Education
Raja Narendra Lal Khan Women's College (Autonomous)
Email: nasimvb@gmail.com
---

১)সংক্রামক ব্যাধি বলতে কী বোঝ? কয় প্রকার কী কী?
What is communicable disease? Explain its types
যে সমস্ত রোগ কোনো মাধ্যমের মধ্যদিয়ে যেমন (জল, বায়ু, পতঙ্গ, জীবাণু ইত্যাদি) এক শরীর হতে অন্য শরীরে প্রবেশ করে তাকে সংক্রামক রোগ বলে।
সংক্রামক ব্যাধি তিন প্রকার
(1) দ্রুত সংক্রামণ-কলেরা, আন্ত্রিক,
(2) মধ্যম সংক্রামণ—ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা।
(3) দীর্ঘ সংক্রামণ—দাদ, চুলকানি প্রভৃতি।

২) সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবিধান আলোচনা কর।
Discuss Prevention and control of Communicable Disease
সংক্রামণ ব্যাধি সঠিক সময়ে প্রতিবিধান না করলে মহামারীর আকার ধারণ করে এবং কয়েকটি বিশেষ রোগ অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় ।সেগুলি হলো:
A রোগের উৎস নির্ধারণ ওনিয়ন্ত্রণ
B রোগ বিস্তারের মাধ্যম প্রতিরোধ।
নিম্নে তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

A রোগের উৎস নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণঃ
(ক) রোগের সুনিশ্চিতকরণঃ সংক্রামক ব্যধি নিয়ন্ত্রণে প্রথম পদক্ষেপটি হল সুনিশ্চিত ভাবে রোগটিকে চিহ্নিত করে, এই কাজের জন্য উৎসস্থল হতে নমুনা সংগ্রহ করতে হবে।

(খ) বিজ্ঞপ্তি জারিকরণঃ সঠিক ভাবে রোগ চিহ্নিত করার পর বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, অফিস ও জনবহুল এলাকায় রোগটির কারণ ও প্রতিবিধান সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।

(গ) পৃথকীকরণঃ সংক্রামক রোগের জীবাণু যাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে পৃথকী করণের ব্যবস্থা করতে হবে। পৃথক দুই ভাবে করা যেতে পারে।–গৃহে পৃথকী করণ ও চিকিৎসা কেন্দ্রে পৃথকীকরণ।

(ঘ) সঠিক চিকিৎসা: রোগ প্রতিরোধের যথাযথ চিকিৎসা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সঠিক সময়ে সঠিক ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে রোগজীবাণু ধ্বংস হলে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠে ফলে রোগ বিস্তারের প্রবণতা কমে যায়।

B রোগ বিস্তারের মাধ্যমে প্রতিরোধ :
সংক্রামক ব্যধির বিস্তারের মাধ্যমকে যদি ছিন্ন করা যায়, তাহলে রোগ বিস্তারের সম্ভবনাই থাকেনা, ইহা নিম্নলিখিত ভাবে সম্ভব। তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

(ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা: সংক্রামক ব্যধির বাহক বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নোংরা আবর্জনার মধ্যে উৎপন্ন হয়। তাই পরিবেশের বিভিন্ন এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখলে সংক্রামক ব্যাধি বাহকের বংশ বিস্তার সম্ভব হয় না।

(খ) বিশোধণ : যে পদ্ধতি অবলম্বনে রোগ সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত করা হয়। তাকে বিশোধন বলে বিভিন্ন ধরনের বিষ বা গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে রোগ জীবানুর বাহকগুলিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হবে।

(গ) প্রতিষোধক ব্যবস্থা: রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিষেধক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক টীকা বিভিন্ন বয়স ও সময়ে গ্রহণ করলে সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রে পোলিও, টিটেনাস ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে পূর্বথেকে প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হয়।

(ঘ) স্বাস্থ্যশিক্ষা: সংক্রামণ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল জনস্বাস্থ্য শিক্ষা। দেশের প্রতিটি মানুষকে বিভিন্ন রোগের কারণ, রোগ বিস্তারের মাধ্যমও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে সংক্রামক ব্যধিকে সহজেই প্রতিরোধ করাসম্ভব।

৩) ম্যালেরিয়া রোগ কী ভাবে সৃষ্টি হয় এবং তার লক্ষণ ও প্রতিকার লেখ ?
Write cause, symptoms and prevention of Malaria

উত্তর: ম্যালেরিয়া প্যারাসাইড (প্লাজামোডিয়াম) নামে এক ধরনের জীবাণু থেকে এই রোগটি হয়। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এই রোগের বাহক। এই মশা কোনো রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ালে ওই জীবাণু মশার দেহে প্রবেশ করে। আবার ওই মশা যখন অন্য কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন সুস্থ ব্যক্তির দেহে ওই জীবাণু প্রবেশ করে এবং ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়।

লক্ষণ: ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর। এই জ্বর কখনো একদিন বা দুই দিন পরে আসে এই রোগের ফলে যকৃৎ ও প্লীহার বৃদ্ধি ঘটে। এই জ্বরের তিনটি অবস্থা দেখা যায়—
(ক) শীতাবস্থা: এই অবস্থায় হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। রোগী এত বেশী কাপতে থাকতে যে লেপ,কম্বল ঢাকা দিয়েও কাঁপুনি বন্ধ হয় না। 99–১০৫ ডিগ্রী পর্যন্ত জ্বর বাড়তে পারে। এই অবস্থায় মাথাধরা, মাথাব্যথা, ভুলবকা ইত্যাদি লক্ষণও দেখা যায়।

(খ) উষ্যবস্থা: শরীরের তাপমাত্রা 104–105° উঠে যাওয়ার পর কাঁপুনী বন্ধ হয়ে যায়। তখন রোগী আর গরম জামা-কাপড় পড়ে থাকতে পারেনা। এইসময় হাত, পা জ্বালা করে, বমি হয়, মাথাধরে এবং অবসন্ন হয়ে যায়।

(গ) ঘামাবস্থা: এই অবস্থায় শরীরে প্রচণ্ড পরিমাণে ঘাম হয়। জামা কাপড় ভিজে যায়। ফলে শরীর আবার ঠান্ডা হতে শুরু করে। এইভাবে চলতে থাকে জ্বরের তিনটি অবস্থা।

প্রতিকার:
(i) রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।
(ii) স্বাস্থ্যসংস্থা, গ্রাম পঞ্চায়েত বা পৌরসভায় জানাতে হবে।
(ii) আক্রান্ত ব্যক্তিকে মশারীর ভিতর রাখতে হবে।
(iv) বাড়ির আশেপাশে নর্দমা ও বদ্ধ জলাশয় পরিষ্কার রাখতে হবে।
(v) মশার বংশ দমন করতে DDT স্প্রে করতে হবে।
(vi) স্যাতস্যাতে জায়গায় থাকা যাবে না।
(vii) ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কুইনাইন ওষুধ খেতে হবে।

৪) ডেঙ্গু জ্বর কি? ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ, সংক্রমণ ও প্রতিরোধ লেখো।
What is Dengue Fever ? Write symptoms,infection and prevention of Dengue Fever
ডেঙ্গু জ্বর হলো স্ত্রী এডিস মশা বাহিত ভাইরাস ঘটিত (ডেঙ্গুভাইরাস) মানবদেহের সংক্রামক রোগ। সাধারণত পৃথিবীর ট্রপিক্যালওসাব-ট্রপিক্যাল অঞ্চলে প্রায় এক শতাব্দী ও অধিক সময়কাল ধরে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা জানা যায়। ভারতবর্ষে সাধারণত ম্যালেরিয়ার পরই ডেঙ্গুই হচ্ছে মশা বাহিত জ্বরে আক্রান্ত হবার সর্বাধিক কারণ। সাধারণভাবে এটি মারণরোগ নয়, তবে আক্রান্ত হলে, আক্রমণের উপসর্গগুলির মধ্যে মারাত্মক রক্ত ক্ষরণ এমন হয়। অনেক সময় রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাড়ায়। সাধারণত ৪-৫দিন ধরে নিম্ন লিখিত রোগ লক্ষণ সহ অসুস্থতা থাকে।
রোগের প্রধান উপসর্গ
(১) প্রবল জ্বর তৎসহ মাথা যন্ত্রণা।
(২) অস্থিসন্ধি ও পেশিতে এত প্রবল যন্ত্রণা ও ব্যথা হয়, যাতে করে রোগীর মনে হয় যেন হাড়ভেঙে যাচ্ছে। তারজন্য একে হাড়ভাঙা জ্বরও বলে।
(৩) রক্তক্ষরণ জনিত ঘটনা : দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম রক্তজালিকা ভেঙে নাক মুখ দিয়ে অথবা মলের সাথে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে; জমাট রক্তের উপস্থিতির কারণে মল অনেক সময়ে কালো রঙেরও হয়ে থাকে।
(৪)অত্যধিক রক্ত ক্ষরণের সাথে দেহে তাপমাত্রা এবং রক্তচাপ কমে যায়। সেইসঙ্গে হৃদ স্পন্দনের হার বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি সারকুলেটরি ফেইলিওর-এর ঘটনাগুলিও ঘটতে দেখা যায়।
(৫) অনেক সময় লিভার বেড়ে যেতে পারে যাকে হেপাটোমেগালি বলা হয়ে থাকে।

কী ভাবে সংক্রমণ ঘটে :
স্ত্রী এডিস মশা ডেঙ্গু রোগাক্রান্ত রোগীর রক্ত পানের সময় এই রোগের জন্য দায়ী ভাইরাস গুলিকে আক্রান্ত রক্তের মাধ্যমে নিজ দেহে গ্রহণ করে। এর পর মশার দেহের মধ্যে ভাইরাস গুলি বংশ বিস্তার করে প্রচুর পরিমাণে সংখ্যায় বাড়লে, স্ত্রী। মশাকে তখন সংক্রমণ কারী মশকী বলা হয়। এই সংক্রমণ কারী মশকীটি যখন অন্য কোনো সুস্থ মানুষের দেহেরক্ত পান করতেযায়, তখন মশকীর দেহস্থিত ভাইরাস গুলি সুস্থ মানুষটির রক্তে মিশে যায় ও ব্যক্তিটি তখন ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ডেঙ্গুজ্বরের রোগী হয়ে ওঠে।

রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় :
(১) বাহক পতঙ্গের বিনাশ করে : ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধে প্রথমে যেটা প্রয়োজন তা হলো ভাইরাসবাহিত বাহক পতঙ্গ, এডিস মশকী আগে নির্মূল করা। তার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা যেতে পারে।
বাড়ির আশেপাশে যাতে কোথাও বেশিদিন জল না জমে থাকে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কারণ এডিস মশা সাধারণত জমে থাকা পরিষ্কার জলে ডিম পাড়ে। প্যারিস গ্রিন, কেরোসিন প্রভৃতি রাসায়নিক স্প্রে করে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা যেতে পারে। তেলাপিয়া, গোল্ডফিস প্রভৃতি মশার লার্ভা ভক্ষণকারী মাছেদের জলাশয়ে মশার প্রজননস্থানে ছেড়ে রাখলে মশালার্ভা অবস্থাতেই বিনষ্ট হয়। ফুলদানি, বাতানুকূল যন্ত্র, রেফ্রিজারেটরে জমে থাকা জল নিয়মিত বদলানো প্রয়োজন।

(২) আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা : ডেঙ্গুরোগীর চিকিৎসার পূর্বে অবশ্যই রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যে রোগটি ডেঙ্গু কিনা ? যেহেতু ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাসঘটিত, সেজন্য এর চিকিৎসার জন্য আপেক্ষিক কোনো ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক নেই কিন্তু ভাইরাস আক্রান্ত দেহ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে (৫ থেকে ৭ দিন) আপনা আপনিই ছেড়ে চলে যায়। তাই সেইসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে রোগীর আক্রান্ত সময়কালে যে সকল উপসর্গগুলি দেখা যায় (যেমন জ্বর) তা যাতে গুরুতর পর্যায়ে না যায় তার জন্য ওষুধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষ করে রক্তক্ষরণজনিত জটিলতার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ গ্রহণ করা ও প্রয়োজনে রোগীকে রক্তদান করা দরকার।। যেহেত ডেঙ্গু জ্বর খুবই সংক্রামক তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আলাদাভাবে ঘরে মশারি খাটিয়ে রাখা উচিত।

(৩) মশার কামড়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা : এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলায় কামড়ায় তাই দিনের বেলায়ও মশারি টাঙানো প্রয়োজন, যাতে আক্রান্ত রোগীকে একটি মশাও না কামড়ায় তা লক্ষ রাখতে হবে।।এই রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় টিকা এখনও সহজলভ্য নয়। তবে ভ্যাকসিন তৈরির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৫) চিকেন পক্স কি? চিকেন পক্সের উপসর্গ, সংক্রমণ ও নিয়ন্ত্রনের উপায়গুলি লেখো।
What is Chicken Pox? Write symptoms, infection and prevention of Chicken Pox
চিকেন পক্স বা জলবসন্ত হলো বায়ুবাহিত, ভাইরাসঘটিত এক ধরনের সংক্রামক চর্মরোগ। ভ্যারিসেলা নামে এক ধরনের ভাইরাসের আক্রমণ এই রোগের জন্য মূলত দায়ী। টিকাকরণহীন সাধারণত প্রায় সব বয়সের মানুষের মধ্যেই এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে। বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালেই এই রোগের বেশি প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

রোগটি কীভাবে সংক্রামিত হয় : উষ্ণস্পর্শকাতর সংক্রামক রোগ এটি। পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও বিদ্যালয়ের সহপাঠীদের মধ্যে যার এই রোগ হয়েছে তার কাছ থেকে হাঁচি, কাশি, নিশ্বাসের বায়র মধ্য দিয়ে সহজেই সংক্রামিত হতে পারে। এই রোগ সংক্রমণের মাধ্যম হচ্ছে বায়ুবাহিত কণা, সর্দিকাশি, নিঃশ্বাসে নিঃসৃত বায়ু ও ফোসকা থেকে নিঃসৃত রস। এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তির পোশাক ও ব্যবহৃত জিনিসপত্রের পরোক্ষ সংস্পর্শের ফলেও এই রোগ দ্রুত প্রসারলাভ করে। আক্রান্ত হওয়ার পর সাধারণত সপ্তাহখানেক পর্যন্ত এই রোগ সংক্রমণের বেশি ভয় থাকে। ফোসকা শুকিয়ে গিয়ে চামড়ার খোসা ঝরে যাবার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলে তবেই এই রোগ সংক্রমণের আর বেশি ভয় থাকে না।

রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ : আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ ভাইরাসের সংস্পর্শে আসার সাধারণত ৩-৪ দিন পর থেকেই
এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই রোগের উপসর্গ হলো এক থেকে দুদিন জ্বর (102°F),
স্বাভাবিক দুর্বলতা, শরীরের ত্বকে ছোপ ছোপ দাগ, যেগুলি ধীরে ধীরে লাল ফোসকাতে পরিণত হয়। ফোসকাগুলি পরে ফাটতে শুরু করে এবং শেষে ফোসকাগুলি শুকিয়ে যায় ও চামড়ার খোসাগুলি ঝরে পড়ে। সংক্রমণ প্রক্রিয়া মুখমণ্ডল থেকে শুরু করে দেহত্বকের প্রায় সর্বত্রই আক্রান্ত করে তোলে। এমনকি রোগ নিরাময়ের পরেও আক্রান্ত স্থানে দাগ থেকে যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদিও তা মিলিয়ে যায়। আবার অনেক সময় দু-একটি জায়গায় গভীর ক্ষতচিহ্নের মতো (পক্সের দাগ) থেকে যায়, যা অনেক সময় সারাজীবনেও মিলোয় না।

রোগের চিকিৎসা : বেশিরভাগ চিকিৎসাই নির্ভর করে লক্ষণের তীব্রতার উপর। দেহের তাপমাত্রা যাতে অতি উষ্ণ।অবস্থায় চলে না যায় তার জন্য নানারকম সতর্কতা নেবার কথা চিকিৎসকেরা বলে থাকেন (যেমন- মাথায় জল ঢালা, গা স্পা করা ইত্যাদি)। এছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ক্ষতস্থানে কিছু আরামদায়ক লোশনও ব্যবহার করা হয়।রোগে তীব্রতার মাত্রা অনুযায়ী অনেক সময় চিকিৎসকেরা অ্যাসপিরিন জাতীয় যন্ত্রণা কমাবার ওষুধও অল্পবিস্তর দিয়ে থাকেন। আসলে ভাইরাসের সঙ্গে লড়বার জন্য কাজে লাগাবার মতো কোনো ওষুধ নেই। অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষধও ভাইরাসকে মারবার জন্য সরাসরি কাজে লাগে না। একটা নির্দিষ্ট সময় পর (৫ দিন থেকে ৭ দিন) আপনা থেকেই ভাইরাস আক্রান্ত দেহত্যাগ করে অন্য দেহে যায়। সেইজন্য রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে দেখতে হবে যাতে ভাইরালটক্সিন নির্গমনের জন্য যে জ্বর আসে তা বেড়ে না যায় বা তীব্র প্রদাহ বা যন্ত্রণা থেকে রোগীকে যতটা সম্ভব মুক্ত করে আরামদায়ক অবস্থায় আনা যায় ততদিন সংক্রমণজনিত রোগ হওয়ায় রোগীকে যতটা সম্ভব আলাদা করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা উচিত।পোশাক-পরিচ্ছদগুলি যাতে ঢিলেঢালা আরামদায়ক হয় সেদিকে নজর দিতে হবে । খোসা ওঠার সময় অনেক ক্ষেত্রে ঘরোয়া পদ্ধতিতে তৈরি নিম, হলুদ ও মাখনের প্রলেপও কার্যকর হয়ে থাকে। বর্তমানে টিকাকরণের মাধ্যমেও এই রোগ অনেক নিয়ন্ত্রণে এসেছে। দুটি পর্যায়ে টিকাকরণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যায়। প্রথম টিকা দেওয়া হয় এক বছর বয়সে এবং দ্বিতীয় টিকা চার বছর বয়সে।

৬) ডায়রিয়া কী? ডায়রিয়ার কারন, লক্ষণ এবং প্রতিকার লেখো।
What is Diarrhea? Write symptoms। Infection and prevention of Diarrhea।
জলের মত বার বার পাতলা পায়খানা হলে তাকে ডায়রিয়া বলে। সাধারণত ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৩ বার বা তার বেশি বার পাতলা পায়খানা হলে তাকে ডায়রিয়া বলে।
ডায়রিয়া সাধারণত তিন ধরনের হয়। যেমন:
১) Acute Watery Diarrhea (একিউট ওয়াটারি ডায়রিয়া): পাতলা পায়খানা ১৪ দিনের কম স্থায়ী হলে এবং পায়খানার সাথে রক্ত না আসলে। এটি বিপজ্জনক নয়।
২।)Persistent Diarrhea (পারসিসটেন্ট ডায়রিয়া): পাতলা পায়খানা ১৪ দিনের বেশি স্থায়ী হলে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে। ৩) Dysentery Diarrhea (ডিসেন্ট্রি): রক্তমিশ্রিত পায়খানা এবং এটি বিপজ্জনক।

ডায়রিয়ার কারণ:
ডায়রিয়ার মূলত ৪টি কারনে হয়। যথা দূষিত খাবার, দূষিত জল , রোগ জীবানু এবং কৃমি।
ডায়রিয়ার প্রকারভেদ

ডায়রিয়ার লক্ষণ:
ডায়রিয়া হলে যে যে লক্ষণগুলি দেখা যায় সেগুলি নিম্নে দেওয়া হলো : ২৪ ঘন্টায় তিনবার অথবা এর চেয়ে বেশিবার জলসহ পাতলা পায়খানা হবে, শরীর দুর্বল হয়ে যাবে, খাবারের রুচি কমে যাবে ইত্যাদি। অনেক সময় ডায়রিয়া শুরুর প্রথম দিকে বমি হয় আবার পরে অনেক ক্ষেত্রে বমি কমে যেতে পারে। জ্বর হতে পারে, তবে সেটা খুব একটা তীব্র হয় না আবার বেশিরভাগ সময় শরীর হালকা গরম থাকতে পারে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে ডায়রিয়ার হলে ঘণ ঘণ পিপাসা, স্বাভাবিকের চেয়ে কম প্রস্রাব কিংবা একটানা ৩ ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে প্রস্রাব হয়।মুখ শুষ্ক দেখায়,শিশুর কান্নার সময় চোখে পানি শুকিয়ে যায় ও শরীর দুর্বল ইত্যাদি হয়ে যায়।

ডায়রিয়া প্রতিরোধের উপায়:
১) স্যালাইন শরীরের জলশূন্যতা রোধ করে। কলেরার জীবাণু দ্বারা ডায়রিয়া হলে প্রতিদিন শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে জলবের হয়ে যায়, যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ডায়রিয়া যত দিন থাকবে, তত দিনই রোগীকে স্যালাইন খেতে দিতে হবে।
২) ডায়রিয়া আক্রান্ত রোগীকে স্যালাইন, ভাতের মাড় অথবা অন্য কোনো বিশুদ্ধপানীয় পান করালে শরীরের লবণ ও জলের যে ঘাটতি তৈরি হয় সেটা কমে যাবে আবার ঘাটতি বেশি হলে সে ক্ষেত্রে কলেরা স্যালাইন খেতে দিতে হবে।
শিশুদের ডায়রিয়া হলে করণীয়-
শিশুর ডায়রিয়া হলে কিছু বিশেষ যত্ন নিতে হবে। যেমন:
১) বারবার খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
২) ছয় মাসের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ ও খাবার স্যালাইন খেতে দিতে হবে।

৩) বেশি করে তরল জাতীয় খাবার যেমন- ভাতের মাড়, ডাবের জল ইত্যাদি খেতে দিতে হবে।
৪) শিশুকে অন্যান্য স্বাভাবিক খাবার খাওয়ানো চালিয়ে যেতে হবে এবং অল্প অল্প করে বারবার খেতে দিতে হবে।
৫) যেসব শিশু মায়ের বুকের দুধ খায়, তাদের ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
৬) স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী জিঙ্ক খাওয়াতে হবে।
৭) খাবার তৈরীর আগে এবং শিশুকে খাওয়ানোর পূর্বে অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে।
৮) সম্ভব হলে শিশুকে অসুস্থ লোক অথবা রোগী থেকে দূরে রাখতে হবে।
৯) বোতলের দুধ খাওয়ানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
১০) সিদ্ধ করা ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে হবে।
১১) ছোট শিশুদের খাওয়ানোর জন্য চামচ ব্যবহার ইত্যাদি করতে হবে।

2।2। Non-Communicable Diseases – Obesity, Diabetes, Asthma।

৭) হাঁপানি বা অ্যাজমা কি? হাঁপানি রোগের কারন, লক্ষণ এবং প্রতিকার লেখো।
What is Asthma? Write symptoms, cause and prevention of Asthma
হাঁপানি একটি শ্বাসকষ্ট সম্বলিত রোগ। কার্যতঃ এটি শ্বাসনালীর অসুখ। এর ইংরেজি নাম অ্যাজমা যা এসেছে গ্রিক শব্দ Asthma থেকে। বাংলায় হাঁপানি। যার অর্থ হাঁপান বা হাঁ-করে শ্বাস নেয়া। হাঁপানি বলতে আমরা বুঝি শ্বাসপথে বায়ু চলাচলে বাধা সৃষ্টির জন্য শ্বাসকষ্ট (Dyspnoea) ।হাঁপানি তিনভাবে প্রকাশ হতে পারে: (১)আপাত সুস্থ লোকের হঠাৎ শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে কয়েক মিনিট বা কয়েক ঘন্টা পরে কষ্ট উপশক এবং রোগী আবার নিজেকে সুস্থ মনে করেন।(২) শ্বাসকষ্ট হঠাৎ আরম্ভ হয়ে আর কমে না; উপরক্ত বেড়ে যেতে থাকে। কোন ওষুধে হাঁপানি কমে না। যদি এ অবস্থা বারো ঘন্টার বেশী স্থায়ী হয়, তবে সে ধরনের হাঁপানিকে বলা হয় স্ট্যাটাস অ্যাজম্যাটিকাস বা অবিরাম তীব্র হাঁপানি। (৩) এক শ্রেণীর রোগীদের শ্বাস পথে বাতাস চলাচলে সব সময়ই অল্প বাধা থাকে। বহুদিন এ অবস্থা থাকার ফলে কষ্টের অনুভূতি কম হয় এবং রোগী অল্প কষ্ট অনুভব করেন। কোন কারণে শ্বাস পথে বায়ু চলাচলে আরো বাধার সৃষ্টি হলে তখনই হাঁপানির কষ্ট অনুভূত হয়।

হাঁপানির লক্ষণ:
১। শ্বাস কষ্ট
২। সাঁ-সাঁ শব্দে কষ্টসহকারে শ্বাস নেয়া
৩। শুকনো কাশি
৪। বুকে চাপ ধরা বা দমবন্ধভাব অনুভব করা।

হাঁপানিকারক কারণসমূহ:
১। অ্যালার্জিকারক (ঘরের ধূলো, পরাগ রেনু, পোষাপ্রাণীর পশম বা পালকের অাঁশ, ত্বকের মামড়ি প্রভৃতি)।
২। জ্বালাকারক বা উত্তেজক (ধোঁয়া, তীব্র গন্ধ, বিভিন্ন বস্তুর বা□)।
৩। জীবাণু সংক্রমণ (নাক, গলা ও বুকে ভাইরাস সংক্রমন)।
৪। ব্যায়াম, অতিপরিশ্রম।
৫। শীতল বায়ু, আবহাওয়ার পরিবর্তন।
৬। মানসিক চাপ ও অবসাদ।
৭। পেশাগত সংস্পর্শ (রাসায়নিক সামগ্রী, রঞ্জক, ডিটারজেন্ট প্রভৃতি)।
৮। ওষুধ (বিটা প্রতিবন্ধক, যেমন- প্রপ্রানল জাতীয় ওষুধ, ব্যাথা প্রশক, যেমন- অ্যাসপিরিন প্রভৃতি)।
৯। খাদ্যের সংরক্ষণ বা গুণগত সমৃদ্ধকারী বস্তু (মেটাবাইসালফেট)।
১০। রং করা খাদ্য (যেমন- হলুদ রং এর জন্য টারটারজিন। অ্যালার্জিজনিত হাঁপানি: অ্যালার্জিজনিত হাঁপানি সবচেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

হাঁপানি বা অ্যাজমা প্রতিরোধের উপায়
১। অ্যালার্জিকারক বস্তু এড়িয়ে চলা। যেমন: ধূলো, বালি, ঘরের ঝুল, ধোঁয়া, ঝাঁঝালো গন্ধ ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।
২। ঘর-বাড়িকে ধুলাবালি মুক্ত রাখার চেষ্টা করা।
৩। বালিশ, তোষক, ম্যাট্রেস-এ তুলা ব্যবহার না করে স্পঞ্জ ব্যবহার করা।
৪। শীতকালে যথাসম্ভব গরম জলে স্নান করা।
৫। ধূমপান না করা।
৬। যেসব খাবারে ও গন্ধে অ্যালার্জিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা পরিহার করে চলা।
৭। ঠান্ডা খাবার, আইসক্রীম ইত্যাদি না খাওয়া।
৮। পরিশ্রম বা খেলাধুলার কারণে শ্বাসকষ্ট বাড়লে চেষ্টা করতে হবে পরিশ্রমের কাজ পরিহার করা।
৯।সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত অভ্যাস করা।
১০। প্রত্যহ যোগব্যায়াম অভ্যাস ও প্রাণায়াম করা

৮) মধুমেয় রোগ কি ? মধুমেয় রোগের কারন, লক্ষণ এবং প্রতিরোধ লেখো।
What is Diabetics? Write symptoms , cause and prevention of Diabetics।
ডায়াবেটিস বা মধুমেহ হল রক্তে গ্লকোজের এর পরিমান বৃদ্ধি জনিত রোগ। ইহা বিপাকে ক্রিয়ার এমনি এক বিশৃঙ্খলা, যেখানে দেহ কলাকোষে খাদ্যের শর্করাকে ব্যবহার করতে পারে না এবং ইহা সেআসরি ফ্যাট ও প্রোটিন বিপাকে বিঘ্ন ঘটায়। শর্করা ক্ষরিত হয় উদর গহরের অবস্থিত গ্রন্থি ক্ষরিত হরমোন ইনসুলিনের এর সাহায্যে। শর্করা লিভারে এলে ইনসুলিন গুকোজকে গ্লাইকোজেনে পরিনত করে। যার কিছু অংশ লিভারে ও পেশীতে জমা হয়। বিভিন্ন কারনে ইনসুলিনের আভাবে শর্করা বিপাকে অসংগঠিত দেখা যায় ফলে রক্তে গ্লকোজের পরিমান বৃদ্ধি পায় এবং প্রসাবে তা নির্গত হয়।একেই মধুমেহ রোগ বলে।

লক্ষনঃ (ক) স্বাভাবিক গঠনের তারতম্য দেখা যায়।

(খ) অল্প কারনে ক্লান্তি আসে
(গ) দেহের ওজন, দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।
(ঘ) পিপাসা বৃদ্ধি পায়
(ঙ) রক্তে সুগারের পরিমান বৃদ্ধি পায়
(চ) বহুমূত্র রোগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা যায়।

প্রতিরোধের উপায়ঃ
(ক) বিজ্ঞানভিত্তিক শরীর চর্চা করতে হবে।
(খ) বিনোদনমূলক খেলাতে অংশগ্রহন করতে হবে
(গ) যোগাসন ও প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হবে
(ঘ) সাতারে অংশগ্রহন করতে হবে।
(ঙ) হাঁটা-চলা, জগিং প্রভৃতিতে অংশগ্রহন করতে হবে

৯) স্থূলাকার রোগ বলতে কি বোঝ? স্থূলাকার রোগের কারন, লক্ষণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি লেখো।
What is Obesity? Write symptoms , cause and treatment of Obesity।
ওবেসিটি মানে অস্বাভাবিক ভাবে মোটা হওয়া কে বুঝি। শারীরিক পরিশ্রমের অনুপাতে দেহে খাদ্যের মাধ্যমে সংগৃহীত খাদ্যশক্তির পরিমান অর্থাৎ ক্যালোরীর পরিমান বেশি হলে তা চর্বিতে রূপান্তর হয় ও ওজন বেড়ে যায়। মানুষের কর্মের তাগিদে বয়স, লিঙ্গ, দেহের আকার, আয়তন, উষ্ণতা
ইত্যাদি অনুপাতে একজন ব্যক্তির কি পরিমান মেদ থাকা প্রয়োজন তা সঠিকভাবে নিয়ে বর্ননা করা হলঃ
শ্রেনীবিভাগ পুরুষ মহিলা
আবসিক মেদ ৫% এর কম ৪% এর কম
সুস্বাস্থ্রে উপযোগী মেদ ১০=২৫% ১৮-৩০%
মেদাধিক্য ২৫% এর বেশী ৩০% এর বেশী
ভালো দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য জরুরী ৫-১৩% এর কম ১২-২২% মেদ

ওবেস এর কারনঃ
(ক) বংশগত কারন (খ) উষ্কক্যালোরী ও স্নেহপদর্থ জাতীয় খাদ্য গ্রহন করলে (গ) বেশী বেশী নিদ্রায় থাকলে ঘ)
থাইরয়েড হরমোনের অসামঞ্জস্যতা থাকলে (ঙ) মাদকদ্রব্য ইত্যাদি গ্রহন করলে। (চ) কর্মহীন জীবন-যাপন করলে ও (ছ) অয়েসী জীবন-যাপন করলে এই রোগটি হতে পারে।

ক্ষতিকারক দিক বা সাফল্যঃ
(ক)হৃদপিন্ডের কর্মক্ষমতা কমায় (খ) উষ্চচাপ, মধুমেহ রোগ সৃষ্টিতে সাহায্য করে (গ) শ্বাসজনিত রোগ হতে পারে (ঘ) মহিলাদের গর্ধারন ক্ষমতার জটিলতা বৃদ্ধি পায় (ঙ) পেশী শক্তি কমতে থাকে (চ) যোনসম্যসা ও শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদি হ্রাস পায়
চিকিৎসাঃ
(ক) প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যে ৩০ মিনিট জোড় গতিতে হাঁটতে হবে (খ) জগিং ও রানিং করলে ভালো ফল পাওয়া যায় (গ) খালি হাতের ব্যায়াম করতে হবে (ঘ) সাঁতার কাটতে হবে (ঙ) বিভিন্ন ধরনের যোগাসন ইত্যাদি অভ্যাস করতে হবে।

১০) সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝ?
What is Balance Diet?
সুষম খাবার বলতে আমরা এমন খাবারের কথা বুঝি যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সবকটি খাদ্য উপাদানই সঠিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। সুষম খাদ্য তালিকায় শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক এবং রোগ প্রতিরোধক খাবার উপযুক্ত পরিমাণে অন্তর্ভূক্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ সুষম খাদ্য বলতে বুঝায় খাদ্যের ৬টি উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণ মতো খাবার যা ব্যক্তিবিশেষের দেহের চাহিদা মেটায়।

১১) জীবদেহে পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা লেখো।
Write the importance of nutrients in human body ।
উত্তর: শরীরকে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে থাকি। যে খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের সুস্থ্যতা নিশ্চিত হয় শরীরের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের সহায়ক হয়, সে খাদ্যই পুষ্টিকর খাদ্য। শরীর সুস্থ্য, সবল ও কর্মক্ষম রাখতে হলে খাদ্য দ্রব্য বয়স ও শ্রমের তারতম্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। প্রয়োজনের তুলনায় দেহে খাদ্য উপাদানের পরিমাণ কম হলে, দেহ দুর্বল ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এই অবস্থাকে পুষ্টিহীনতা বলে। শরীরকে সুস্থ্য ও কর্মক্ষম রাখার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুর দেহের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের প্রয়োজন। জন্মের পর থেকে ৫ বছর পর্যন্ত শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে ঘটে থাকে। এ সময় চাহিদার তুলনায় কম খাবার দিলে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং শিশু অপুষ্টির শিকার হয়। অপুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের কারণে শিশুর দেহে ক্যালরির অভাব হয় । এর ফলে শিশুর দেহে জীবাণু সংক্রমিত হয়ে প্রোটিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তদ্রুপ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দেহেও পর্যাপ্ত ক্যালরির অভাব হলে দেহ দুর্বল ও অসাড় হয়ে পড়ে। কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং দেহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। সে জন্য কেবল খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং এই খাদ্য অবশ্যই বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের সংমিশ্রনে হতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে হতে হবে। প্রতিদিন যে সকল খাদ্য আমরা গ্রহণ করি তার পুষ্টিগত উপাদান পরিপাক ও বিশোধনের পর দেহের তিন প্রকার কাজ সম্পাদন করে সেগুলি হল-
(1) দৈহিক বৃদিধ ও ক্ষয়পূরণ : যে সকল আহার্য্য বস্তু আমরা গ্রহণ করি তার বেশিরভাগ অংশই জীবদেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণে ব্যয় হয়। সালোক সংশ্লেষের সময় উদ্ভিদদেহে সৌরশক্তি প্রথমে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে খাদ্যের মধ্যে আবদ্ধ হয়। শ্বসন কালে ঐ শক্তি তাপ শক্তিতে রুপান্তরিত হয়ে জীবদেহের যাবতীয় বিপাকক্রিয়াগুলি নিয়ন্ত্রণ হয় । জীবদেহের খাদ্যের কার্যকারিতা অনুযায়ী খাদ্যকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা যায়-
A দেহ পরিপোশক খাদ্য :- শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাট খাদ্যের এই তিনটি উপাদান দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা নেয়।
B দেহ সংরক্ষণ খাদ্য :- ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল এই তিনটি উপাদান প্রতিনিয়ত পরিবেশের থেকে আমাদের শরীরে রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
(2) জীবনী শক্তি ও শারীরিক সক্ষমতা:- শারীরিক সক্ষমতা অনেক অংশে খাদ্যের উপস্থিত পুষ্টিগত উপাদানের উপর নির্ভর করে। সুষম খাদ্যের অভাবে দৈহিক হ্রাস ও

জীবনী শক্তি কমে আসে। প্রোটিন, খনিজ লবন ও ভিটামিনের অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শরীরে অনাক্রমতা হ্রাস পায়। বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ ও ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগ সৃষ্টি হয় যা জীবনী শক্তি হ্রাস ও অসক্ষমতার জন্য দায়ী।
(3) দেহের প্রয়োজনীয় তাপ শক্তির উৎপাদন - বেঁচে থাকার জন্য প্রতি মুহূর্ত তাপশক্তি প্রয়োজন হয় যা মূলত দেহ গঠনকারি খাদ্যগুলি হতে সরবরাহ হয়। দেহের তাপ শক্তির চাহিদা নির্ভর করে কাজের প্রকৃতি,দেহের গঠন ও কাজের ধরণ অনুযায়ী, তবে সম্পূর্ণ বিশ্রামগতি অবস্থায় যে নিম্নতম শক্তির প্রয়োজন হয়, তা মূলত শর্করা থেকে আসে। সঠিক পুষ্টি না হলে বা সুষম খাদ্যের অভাবে দেহের প্রয়োজনীয় তাপশক্তির অভাব দেখা দেয় যার ফলে ব্যক্তির অক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত অবসাদ গ্রস্থ হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন এই পরিস্থিতি বা অপুষ্টির ফলে শারীরিক সক্ষমতার হ্রাস ও বিভিন্ন রোগের আক্রমণ ঘটে।

১২) প্রোটিন, ভিটামিন, খনিজ লবন ও জলের অভাবে কি কি রোগ হয় তা লেখো
Deficiency of protein, vitamin mineral
প্রোটিনের অভাব
(i) দেহের প্রতিটি অঙ্গের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ঘটে না।
(ii) উৎসেচক ও হরমোন উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে।
(iii) দেহের ওজন কমে যায়।
(iv) দেহের গঠন পাতলা হয়।
(v) দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে।
(vi) হরমোন উৎপাদন ব্যাহত হয়।
(vii) দেহের তাপমাত্রা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না ।

ভিটামিনের অভাব :-
A - রাতকানা /Tode skin
B- বেরিবেরি
B2– রক্তাল্পতা
D– রিকেট/অস্ট্রিও ম্যালেশিয়া
E- বন্ধ্যাত্ব
K—রক্ততঞ্চন হ্রাস।

খনিজ লবণের অভাব :-
Fe—রক্তাল্পতা।
K/P——রিকেট
Ca—অস্থিভঙ্গুরতা
Na—পেশি সংকোচনে বাধা
I—গলগন্ড।

১৩) দেহভঙ্গিমা বলতে কি বোঝ? দেহভঙ্গিমার বিকৃতি বলতে কি বোঝ? দেহভঙ্গিমার প্রকারভেদগুলি কি কি? বিভিন্ন ধরনের দেহভঙ্গিমার কারন ও ব্যায়ামগত চিকিৎসা আলোচনা করো।
what is posture? what is Postural Deformities? types of Postural Deformities? Cause and Exercise-therapy of postural Deformities।

দেহভঙ্গিমা হলো কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে দেহ অবস্থান, দাড়ানো, হাঁটা।
বা বসার সময় কোন ব্যক্তি কিভাবে নিজের দেহকে বহন করে তার সাথে দেহভঙ্গিমা সম্পর্ক যুক্ত।
দেহভঙ্গিমার বৈশিষ্ট্য ? -
১) স্বাস্থ্যপূর্ন ও সুস্থদেহ নির্দেশ করে।
২) শরীর সুদৃঢ়, শক্তিশালী ও সক্ষমতায় ভরপুর হয়।
৩) দেহখন্ড, মাথা ও গলা একই উলম্ব রেখায় থাকে।
৪) দাঁড়ানোর সময় দুটি পায়ের উপর ভার সমানভাবে পতিত হয়।
৫) মেরুদন্ডের বক্রতা স্বাভাবিক ইত্যাদি থাকে ।

প্রঃ - দেহভঙ্গিমার বিকৃতি কাকে বলে?
যদি শরীরে কোন অঙ্গে সামান্য বা বেশি ত্রুটি দেখা যায়, যার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবেশের সাপক্ষে দেহের অবস্থান স্বাভাবিকের তুলনায় নিজের ভার বহন করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তখন দেহভঙ্গিমার বিকৃতি দেখা যায় বলে ধরে নেওয়া হয়।
দেহভঙ্গিমার বিকৃতির ধরন ?
১) কাইফোসিস (Kyphosis)
২) লডোসিস (Lordosis)
৩) স্কোলিওসিস (Scoleosis)।
৪) নকনি (Knocknee)
৫) ফ্লাট-ফুট (Falt-foot) ইত্যাদি।

১)কাইফোসিসঃ - মেরুদন্ডের অস্বাভাবিক বক্রতার কারনে যখন পিঠের পিছনে কুজ দেখা তখন এই
রোগটি হয়। কান, গলা, মাথা সামনের দিকে এগিয়ে যায় ফলে থোরাসিক অঞ্চলটি পিছন দিকে বেরিয়ে।

আসে।
কাহফোসিস রোগের প্রতিকার ও কাইফোসিস রোগটি দূরীকরণের পদ্ধতি হল ব্যায়ামগত চিকিৎসা, সেই।
ব্যায়াম গুলি হল, চক্রাসন, যুগাসন, হলাসন, ভুজঙ্গানাসন ইত্যাদি।
কাইফোসিস রোগের কারণ ও দীর্ঘ সময় ঝকে কাজ করলে এই রোগটি হয়।

২) স্কোলিওসিস - মেরুদন্ডের পার্শ্বভীমুখি বক্রতার কারনে দুটি কীপ উচু নিচু হয় এতে থোরাসিক ও
কন্ধ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হয় ফলে এর ধরনের রোগটি সৃষ্টি হয়।
স্কোলিওসিস রোগের কারন ?
ক) মাথা ও কাঁধে ভারী জিনিস বহন করলে এই রোগটি হয়।।
খ) জন্মগতকারনে কিংবা জন্মের পরেও এই রোগটি হয়।
গ) দূর্ঘটনা জনিত কারনে এই রোগটি হতে পারে।
স্কোলিওসিস রোগের প্রতিকার ও বিভিন্ন ধরনের সাইড স্ট্রেচিং (প্রসারিতকারী ব্যায়াম) ব্যায়াম
করলে এই রোগটি প্রতিকার করা যায়।

৩) লর্ডোসিস: মেরুদন্ডের লাম্বার অংশের সমুখ প্রসারণ ও বক্রতার কানে এই জুটির সৃষ্টি হয়। এর ফল স্বরুপ পেট সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং পশ্চাত ভাগ একটি ছোট্ট গর্ভের সৃষ্টি হয়।
লর্ডোসিস্ রোগের কারণ:
ক) অতিরিক্ত খাওয়ার কারনে শরীরে যদি মেদ জমে তাহলে এই রোগটি দেখা যায়।।
খ) দীর্ঘক্ষন মোটরবাহিক আরোহনের ফলে এই রোগটি দেখা যায়।
লডোসিস রোগের প্রতিকার ও বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ এবং যোগাসন যেমন-
পশ্চিমাত্তসন,হলাসন, পদহস্তাসন প্রভৃতি।

৪) নক-নি ব্যক্তি যখন দাড়ায় বা চলা ফেরা করে তখন হাঁটু দুটি পরস্পরের স্পর্শ করে ফলে চলতে অসুবিধা হয়।
নক-নি রোগের কারণ: ভিটামিনের ও ক্যালসিয়ামের অভাবে এই রোগটি হয়।
নক-নি রোগের প্রতিকার: বিভিন্ন ধরনের স্ট্রেচিং এক্সারসাইজ যেমন ফরোয়ার্ড লংজিং,
অ্যাস্কেলস্ট্রেচিং, সাইড লঙজিং প্রভৃতি এছাড়া যোগাসন গুলি হল, ধনুরাসন, সুপ্তবজ্রাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি।

৫) ফ্লাট- ফুট: এই ধরনের জুটি পদতলের বক্রতা কম থাকে। এর ফলে খালিপায়ে দাড়ালে পায়ের
তলার বেশিরভাগ অংশ মাটি স্পর্শ করে ফলে চলতে ফিরতে অসুবিধা হয়।
ফ্লাট-ফুটের কারণ: দুর্বল পেশি, ওজন বাড়া, বেশি ওজন বহন করলে।
ফ্লাট-ফুটের রোগের প্রতিকার: বজ্রাসন, সুপ্তবজ্রাসন অ্যাঙ্কেল স্ট্রেচ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র:
যে যে বইগুলো এই নোটটি বানাতে আমাকে সাহায্য করেছে সেই বইগুলির নাম ও লেখকের নাম নিম্নে দেওয়া হলো:
১) আয়রনম্যান্স ফিজিও-থেরাপি; ডাঃ অশোককুমার বৈদ্য ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়
২) শারীর চিকিৎসা; কানাই লাল সাহা
৩) শারীর শিক্ষা চয়ন; ড তীর্থ মন্ডল
৪)এসেন্সিয়াল অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন; ড আজমের সিং, ড জগদীশ বাইন্স et al
৫) আধুনিক শারীর শিক্ষা ও শিক্ষন পদ্ধতি; প্রণতি মোদক সাহা
৬) রোগ নিরাময়ে ফিজিওথেরাপি; ডাঃ সুনীল ঠাকুর
৭) ডায়াবিটিস ও তার প্রতিকার; ডাঃ পূর্ণেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায়
৮) ঘরে বসে ফিজিওথেরাপি; সত্যজিৎ ব্যানার্জি
৯) উচ্চতর শারীর শিক্ষা; শ্রী শুভব্রত কর ও ড: ইন্দ্রনীল মন্ডল
১০) থেরাপিউটিক ডাইমেনশন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন; অরুন কুমার ভট্টাচার্য্য et al

+